মানসিক রোগ নিয়ে নানা বিভ্রান্তি

ডা. মুনতাসীর মারুফ

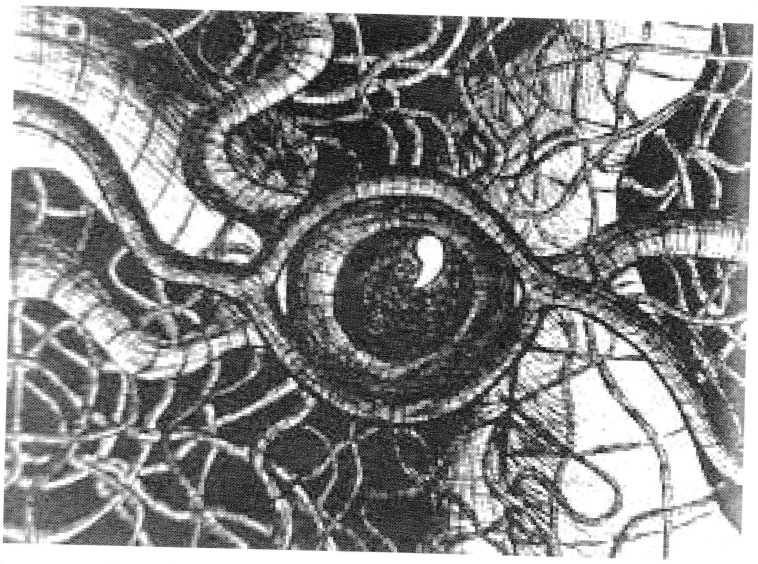

'পাগল' বলতে অনেকের কাছে যে চিত্রটি ফুটে ওঠে তা হচ্ছে -- উলঙ্গ অথবা ময়লা-জীর্ণ-শতচ্ছিন্ন কাপড় জড়ানো এক ব্যক্তি, যে রুক্ষ জটপাকানো চুলে, পুরুষ হলে মুখে দাঁড়ি-গোঁফের জঙ্গল নিয়ে, রাস্তায় রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ান; ডাস্টবিন ঘেঁটে খাবার কুড়োন; অশ্রাব্য গালি-গালাজ বা অশ্লীল বাক্যের তুবড়ি ছোটান; যখন-তখন যে কারো দিকে তেড়ে যান -- আক্রমণ করে বসেন, ভাঙচুর করেন ইত্যাদি ইত্যাদি। দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, 'মানসিকভাবে অসুস্থ' বা 'মানসিক রোগী' বলতেও অনেকের চোখে রোগী বা অসুস্থ ব্যক্তিটির এই ধরনের চিত্রই ফুটে ওঠে, যা পুরোপুরি অজ্ঞতাপ্রসূত।

তাহলে মানসিক রোগ কী? মানসিক অসুস্থতা বলতে কী বোঝায়? সহজ কথায় মানসিক অসুস্থতা হচ্ছে মনের রোগ। শরীরের যেমন রোগ হয়, রোগ হয় মনেরও। শরীরের যেমন অনেক অংশ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মনও তেমনি অনেকগুলো বিষয়ের সমষ্টি। শরীরকে যেমন ভাগ করা যায় মাথা, হাত, পা, চোখ, পেট, বুক, শরীরের ভেতরের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, কিডনি, যকৃত, পাকস্থলী ইত্যাদি নানা অংশে, তেমনি মনও অনুভূতি, আবেগ, বোধ, চিন্তা, স্মৃতি ইত্যাদি নানা উপাদানে গঠিত। শরীরের একেক অংশের রোগ, এর উপসর্গ-লক্ষণ যেমন একেক রকম, তেমনি মনের নানা উপাদানের অসুস্থতাজনিত বহিঃপ্রকাশও ভিন্ন ভিন্ন। আবার, শরীর ও মন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িতও। শারীরিক রোগে যেমন মানসিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে, তেমনি মানসিক রোগের বহিঃপ্রকাশও ঘটতে পারে শারীরিক লক্ষণের মাধ্যমে।

বোঝার সুবিধার্থে মানসিক রোগগুলোকে মোটা দাগে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একটি হচ্ছে নিউরোসিস, অপরটি সাইকোসিস। নিউরোসিস-জাতীয় রোগে আবেগের প্রকাশ বা মাত্রা স্বাভাবিকতা অতিক্রম করে যায়। যেমন মন খারাপ, উদ্বেগ, ভয় এগুলো মানুষের স্বাভাবিক আবেগীয় প্রকাশ। দুঃখ বা ব্যর্থতায় যে কারো মন খারাপ হতে পারে। যে কোন দুঃসংবাদ বা বিপদাশংকায় উদ্বেগও স্বাভাবিক। কুকুর, উচ্চতা বা অন্ধকারে কিছুটা ভয়ও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এইসব আবেগ স্বাভাবিক মাত্রা ও সময়কে অতিক্রম করে যখন ব্যক্তির জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে এবং তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, শিক্ষা বা পেশাগত জীবনকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাধাগ্রস্ত করে, তখনই কেবল তা রোগ হিসেবে চিহ্নিত হয়। আবার, অনেক সময় মানসিক চাপের প্রকাশ ঘটে শারীরিক কোন উপসর্গে -- এসব ক্ষেত্রে উপসর্গ শারীরিক হলেও, এর পেছনে শারীরিক কোন রোগের প্রমাণ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পাওয়া যায় না। নিউরোসিস-এর ক্ষেত্রে রোগী সাধারণত বাস্তবতার সাথে সংযোগ হারান না এবং তার ব্যক্তিত্বেরও উল্লেখযোগ্য কোন বিশৃংখলা ঘটে না। বিষণ্নতা (ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার), উদ্বেগাধিক্য (অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার), অহেতুক ভীতি (ফোবিক ডিসঅর্ডার), শুচিবায়ু (অবসেসিভ-কমপালসিভ ডিসঅর্ডার) প্রভৃতি নিউরোসিসের উদাহরণ। অন্যদিকে 'সাইকোসিস'-এর রোগীদের আচার-আচরণ, ব্যবহার বা কথাবার্তা, ব্যক্তিত্ব এলোমেলো, বিশৃংখল হয়ে যায়। বাস্তবের সাথে তাদের সংযোগ থাকে না। অনেকের মাঝে অযৌক্তিক, ভিত্তিহীন, ভ্রান্ত অথচ দৃঢ় বিশ্বাস দেখা দেয়। যেমন, সাইকোসিসে আক্রান্ত অনেক রোগী বিশ্বাস করেন -- সবাই তার শত্রু, সবাই তার ক্ষতি করার জন্য ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে, অথবা সে নিজে বিরাট ক্ষমতার অধিকারী, অনেক টাকা-পয়সা বা ক্ষমতার মালিক -- যদিও বাস্তবে এর কোনটিই সত্য নয়। অনেকে গায়েবি আওয়াজ শোনেন বা গায়েবি কিছু দেখেন। তারা সাধারণত নিজেরা বুঝতে পারেন না যে তারা রোগাক্রান্ত। আশপাশের লোকজন সহজেই তাদের ভেতর এই পরিবর্তনটি ধরতে পারেন। সিজোফ্রেনিয়া, ম্যানিয়া বা বাইপোলার ডিসঅর্ডার -- এগুলো সাইকোসিসের উদাহরণ। এছাড়া মাদকাসক্তি, মানসিক প্রতিবন্ধ, ব্যক্তিত্ব বৈকল্যসহ আরও অনেক ধরনের মানসিক রোগ রয়েছে। আবার শারীরিক রোগের কারণেও দেখা দিতে পারে মানসিক রোগের লক্ষণ-উপসর্গ।

কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, আমরা অনেকেই এখনও 'মানসিক রোগ' বলতে আটকে আছি ঐ 'পাগল'-এই। অথচ 'পাগল' বলতে যে চিত্র ভেসে ওঠে, মানসিক রোগীদের মধ্যে যারা সাইকোসিসে ভোগেন তাদের কেবল একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই সেরকম লক্ষণ-উপসর্গ দেখা যায়। এই ক্ষুদ্র অংশেরও অধিকাংশ চিকিৎসা নেন না বা চিকিৎসার আওতায় আসেন না বলেই উপসর্গগুলো এই পর্যায়ে পৌছায়। সময়মতো ও যথাযথ চিকিৎসায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীর অতটা অবনতি সহজেই রোধ করা যায়।

বাংলাদেশে মানসিক রোগ বিষয়ক সচেতনতা ও এসব রোগের হার নির্ণয়ের জন্য ২০০৩-২০০৫ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের গবেষকদল জাতীয় পর্যায়ে একটি জরিপ চালান। সেখানে দেখা গেছে, বাংলাদেশে ১৮ বছরের উপরের জনসংখ্যার ১৬.১% মানুষ মৃদু থেকে গুরুতর মানসিক রোগে ভুগছেন। আরও উল্লেখ করার মতো ব্যাপার হচ্ছে, এর মধ্যে ১.১% সাইকোসিসে আক্রান্ত। যে সাইকোসিসের একটি ক্ষুদ্র অংশের উপসর্গের সাথে মিল রয়েছে তথাকথিত 'পাগল'দের। বাকি ১৫% রোগীর মধ্যে মাদকাসক্তি ও অন্যান্য কিছু রোগ বাদে প্রায় সবাই নিউরোসিসে ভুগছেন, যারা তাদের যে সমস্যা বা

কষ্ট হচ্ছে তা নিজেরাই বুঝতে পারেন। কিন্তু বুঝতে পারা সত্ত্বেও তারা চিকিৎসা নিতে যান না। কারণ, সমস্যা বুঝলেও সেটা যে মানসিক রোগ তা তারা বুঝতে পারেন না। ঐ যে -- মানসিক রোগী মানে তো 'পাগল'! তারা ভাবেন -- আমি তো আর পাগল না! হ্যাঁ, আমার তো খুব মন খারাপ লাগে, কিছু করতে উৎসাহ পাই না, আত্মহত্যা করার ইচ্ছা জাগে তীব্রভাবে -- কিন্তু আমি তো 'পাগল' না! অথবা আমার রাতের পর রাত, দিনের পর দিন ঘুম আসে না -- কিন্তু কোন 'পাগলামি' তো আমি করি না! তাহলে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাব কেন? সাইকিয়াট্রিস্ট বা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে তো যাবে 'পাগল'রা। আবার অনেকে এটাকে মানসিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারলেও, মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যান না। মানসিক রোগের ডাক্তারের কাছে যাব বা মানসিক রোগের হাসপাতালে যাব? -- লোকে কী বলবে? লোকে তো আমাকে 'পাগল' ভাববে! অধিকাংশ মানুষ এখনও তা-ই ভাবেন। অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের কাছে এখনও মানসিক রোগ মানেই 'পাগলামি'। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, এমনকি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝেও এই প্রবণতা দেখা যায়। 'পাগল' অভিধায় মানসিক রোগী যেন সমাজে অচ্ছুত, তার পরিবার যেন একঘরে। শারীরিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য পরিবার বা সমাজে যতটা আন্তরিকতা দেখা যায়, 'পাগল'দের জন্য তা মোটেও দেখা যায় না। বরং, মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারকে করুণার চোখে, হেয় করে দেখার প্রবণতা এখনও বিদ্যমান। এজন্য 'পাগল' অ্যাখ্যায় সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে মানসিক রোগে আক্রান্ত অনেক ব্যক্তিই চিকিৎসকের কাছে যান না, পরিবারও তাকে চিকিৎসা না করিয়ে ব্যাপারটি গোপন রাখতেই উৎসাহিত হন, যদিও মানসিক রোগের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা রয়েছে।

আবার, মানসিক রোগ বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই স্বীকার করতে চান না অনেকে। গায়েবি আওয়াজ শোনা, ভ্রান্ত কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস, অহেতুক সন্দেহ, আচার-আচরণ বা কথাবার্তার অস্বাভাবিক পরিবর্তন, কনভার্সন ডিসঅর্ডার (যা হিস্টিরিয়া বা মূর্চ্ছারোগ নামেই বেশি পরিচিত) -- এসব উপসর্গগুলোকে জিন-ভূতের আছর, জাদু-টোনা-তাবিজ-আলগা বাতাসের প্রভাব বলেই বিশ্বাস করেন অনেকে। আত্মীয়স্বজন এসব সমস্যায় আক্রান্ত হলে তারা চিকিৎসাও করান তেল-পড়া, পানি-পড়া, তাবিজ, ঝাঁড়-ফুঁক, 'শিকল থেরাপি' ইত্যাদির মাধ্যমে। অনেকের কাছে মানসিক রোগের উপসর্গগুলো বয়সের দোষ, বিয়ের জন্য টাল-বাহানা, ঢং বা ভং ধরা। চিকিৎসার ব্যাপারে এদের বিশ্বাস -- 'মাইরের উপর ওষুধ নাই'। কারো কারো কাছে আবার মানসিক রোগের লক্ষণ ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। শারীরিক উপসর্গ যে কখনো কখনো মানসিক রোগের কারণে হতে পারে, তাও অনেকে মানতে চান না। ফলে, মানসিক সমস্যার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে শারীরিক উপসর্গ নিয়েই ব্যতিব্যস্ত থাকেন তারা।

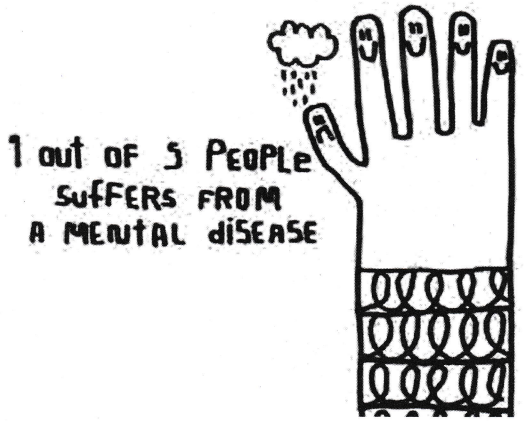

এতসব কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও লোকলজ্জার বেড়াজাল ডিঙিয়ে যারা মানসিক রোগ চিকিৎসার আওতায় আসেন, তাদেরও বড় একটা অংশ ওষুধ নিয়ে নানান বিভ্রান্তিতে সঠিক চিকিৎসা করান না। পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিকে মানসিক রোগ চিকিৎসার আধুনিক ওষুধ আবিস্কৃত হয়। এর পর সময়ের গতির সাথে মানসিক রোগ চিকিৎসারও অগ্রগতি হয়, আবিষ্কৃত হয় নতুন নতুন ওষুধ, সেসব ওষুধের সফল প্রয়োগ মানসিক রোগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখে। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণ জনগণ, এমনকি চিকিৎসকদের একাংশের মাঝেও মানসিক রোগের ওষুধ সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এখনও বিদ্যমান।

মানসিক রোগের ওষুধের ক্ষেত্রে একটি ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে, এগুলো খেলে ব্রেনের ক্ষতি হয়, ব্রেন নষ্ট হয়ে যায়, মস্তিষ্ক আর কখনোই স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে না ইত্যাদি। অনেকের ধারণা, এসব ওষুধ শুধু ঘুম পাড়ায়, আর কোন কাজে আসে না। সার্বিকভাবে আমাদের দেশে ওষুধ সংক্রান্ত গবেষণা ও নতুন ওষুধ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হয় না। উন্নত বিশ্বে, যেখানে প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন ওষুধ আবিষ্কার ও এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হচ্ছে, সেখানকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ওষুধ বাজারজাতকরণের অনুমতি দিয়ে থাকে। যে কোন রোগের চিকিৎসায় নতুন কোন ওষুধ আবিস্কৃত হলে তা নির্ধারিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে মানবদেহে তা কতটা কার্যকর ও নিরাপদ তা পরীক্ষা করার পরই কেবল কার্যকারিতা ও মানবদেহের নিরাপত্তা বিবেচনায় তা বাজারজাতকরণের অনুমতি দেয়া হয়। তারপরও অব্যাহত থাকে ঐ ওষুধ নিয়ে গবেষণা। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেখানে নতুন ওষুধ কার্যকর হলেও মানবদেহে এর ক্ষতিকর প্রভাব উপকারের তুলনায় বেশি হওয়ায় তা আর বাজারে আসেনি। উন্নত বিশ্বে এভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত ওষুধই উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলোতেও, যারা গবেষণায় পিছিয়ে, ব্যবহৃত হয়। অন্য যে কোন ওষুধের মতো মানসিক রোগের ওষুধের ক্ষেত্রেও একই ধারা অনুসরণ করা হয়। নির্ধারিত গবেষণার ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ার পরই এসব ওষুধ চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছে। যদি মানসিক রোগের ওষুধে মস্তিষ্ক নষ্টই হয়ে যেত অথবা ঘুম ছাড়া চিকিৎসায় আর কোন কাজ-ই না করতো, গবেষণায় তা নিশ্চয়ই ধরা পড়তো এবং এসব ওষুধ কখনো বাজারজাতকরণের অনুমতি পেত না।

তবে, এ কথা বলা হচ্ছে না যে, মানসিক রোগের ওষুধের কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। আবিস্কৃত কোন কার্যকর অ্যালোপ্যাথিক ওষুধই শতভাগ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত নয়। এমনকি আমরা মুড়িমুড়কির মতো যে প্যারাসিটামল আর গ্যাসের ওষুধ (অ্যান্টিআলসারেন্ট) খেয়ে থাকি, সেগুলোও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন নয়। তবে, সেগুলো আমরা নিয়মিতই খাচ্ছি। মনে রাখতে হবে, একটি ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় সব সেবনকারী আক্রান্ত হন না। কোন কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নগণ্য সংখ্যকের হতে পারে। কিছু সাধারণ, সহনীয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে অনেক সেবনকারীর। কিন্তু এইসব প্রতিক্রিয়ার তুলনায় এসব ওষুধের কার্যকর প্রভাবের হার বেশি হওয়ায়, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার আশংকাটুকু চিকিৎসাবিজ্ঞানে 'গ্রহণীয়' বলেই ধরা হয়। মানসিক রোগের ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু, সাধারণভাবে মানসিক রোগ ও এর ওষুধ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক হওয়ায়, না জেনেই অনেকে এসব ওষুধ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে থাকেন। অনেকে গবেষণালব্ধ ফল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেও কেন যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন না। অবাক ব্যাপার হচ্ছে, উন্নত বিশ্বের কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শারীরিক ওষুধ সম্পর্কিত গবেষণালব্ধ ইতিবাচক ফলাফল যারা সাদরে গ্রহণ করছেন, কুসংস্কার আর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারাই আবার একই স্থান থেকে একই গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণে প্রাপ্ত

মানসিক রোগের ওষুধ সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফলে আস্থা রাখছেন না, এমন উদাহরণ বিরল নয়।

মানসিক রোগী বা তার আত্মীয়স্বজনের খুবই কমন একটি প্রশ্ন -- 'ওষুধ কতদিন খেতে হবে?'। যখন তাদেরকে দীর্ঘমেয়াদে ওষুধ ব্যবহারের কথা বলা হয়, তারা এই উপদেশ মানতে দ্বিধা বোধ করেন। এর কারণও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতির ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদে এবং অনেক ক্ষেত্রে আজীবন ওষুধ খাবার জন্য রোগীরা মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন। মৃগীরোগ, বাতজ্বর প্রভৃতি রোগেও কয়েক বছর ওষুধ সেবনের ব্যাপারটিও এখন রোগীরা স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করছেন। বিভিন্ন মাধ্যম ও পর্যায়ে দীর্ঘদিনের প্রচারণা, তথ্য সরবরাহ ও শিক্ষার মাধ্যমেই এসব রোগের চিকিৎসা ও ওষুধের ব্যাপারে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক হয়েছে। কিন্তু মানসিক রোগে দীর্ঘমেয়াদে ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে সমাজের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এখনও নেতিবাচক। কিছুদিন ওষুধ খাওয়ার পর রোগী যখন ভাল বোধ করেন বা উপসর্গ কমে যায়, তখন রোগী বা তার আত্মীয়স্বজন চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই ওষুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দেন। ফলে, রোগীর সঠিক চিকিৎসা হয় না। এবং কিছুদিন পর রোগীর উপসর্গ আবার ফিরে আসে। সঠিক প্রচারণা ও কার্যকর তথ্যসরবরাহব্যবস্থার মাধ্যমেই এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সম্ভব।

অনেকের ধারণা, মানসিক রোগের ওষুধে আসক্তি (অ্যাডিকশন) তৈরি হয়, একবার রোগী ওষুধ খাওয়া শুরু করলে আর ছাড়তে পারেন না। এই ধারণার পক্ষে কোন গবেষণালব্ধ প্রমাণ নেই। শুধুমাত্র বেনজোডায়াজেপিন গ্রুপের ওষুধ (ডায়াজিপাম, ক্লোনাজিপাম, অ্যালপ্রাজোলাম প্রভৃতি -- অনিদ্রা ও উদ্বেগজনিত সমস্যার জন্য যা ব্যবহৃত হয়) দীর্ঘদিন টানা খেলে আসক্তির সমস্যা দেখা দেয়। বিষণ্নতারোধী (অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট) বা জটিল মানসিক রোগে ব্যবহৃত ওষুধে (অ্যান্টিসাইকোটিক) আসক্তির সমস্যার কোন বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ নেই। তবুও অজানা কারণে এই ধারণাই পোষণ করছেন অনেকে। আবার দেখা যায়, আসক্তির ভ্রান্ত আশংকায় অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট বা অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ খেতে চান না যিনি, তিনিই মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ঘুমের সমস্যার জন্য খেয়ে যাচ্ছেন বেনজোডায়াজেপিন গ্রুপের ওষুধ!

মানসিক রোগের ওষুধ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী অনেকে আবার ওষুধ ছাড়া শুধু সাইকোথেরাপি বা কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে রোগীকে সুস্থ করে দেয়ার দাবি জানান। বাস্তবতা হচ্ছে, মানসিক রোগের ধরন অনুযায়ী ওষুধ, সাইকোথেরাপি ও অন্যান্য চিকিৎসাব্যবস্থা রয়েছে। কোন রোগের জন্য কোন ধরনের চিকিৎসা প্রয়োজন, তার গবেষণাভিত্তিক দিক নির্দেশনা রয়েছে। কিছু রোগের চিকিৎসায় যেমন সাইকোথেরাপিই প্রথম পছন্দ, আবার সিজোফ্রেনিয়া, ম্যানিয়া, মাঝারি থেকে তীব্র বিষণ্নতাসহ আরও কিছু রোগে ওষুধ অপরিহার্য।

মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ রোগীর রোগ নির্ণয় করে তার জন্য কোন ধরনের চিকিৎসাপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে সে পরামর্শ দেবেন। মানসিক সমস্যা হলেই যে সাথে সাথে ওষুধ সেবন শুরু করতে হবে, সেটা যেমন ঠিক নয় তেমনি সব মানসিক সমস্যা ওষুধ ছাড়াই ভালো হয়ে যাবে তাও সত্য নয়। মানসিক রোগের ওষুধ শুরুও করতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে, বন্ধও করতে

হবে তার পরামর্শমতো।

তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগেও, নিমেষেই সকল তথ্য হাতে পাওয়ার অপার সুযোগের এই সময়েও, মানসিক রোগ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার এই চলমান ধারা খুবই দুঃখজনক। মানসিক রোগীদের সঠিক চিকিৎসার আওতায় আনার জন্য প্রয়োজন সকলের মাঝে মানসিক রোগ সম্পর্কে সচেতনতা।

মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা
E-mail: marufdmc@gmail.com